ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্য পড়ি লিখতে শিখি

১ম পরিচ্ছেদ

কবিতা

কবিতা পড়ি ১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'গোরা', 'অচলায়তন', 'কালান্তর' তাঁর কয়েকটি বইয়ের নাম। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটি তাঁর রচিত। নিচে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা দেওয়া হলো। কবিতাটি তাঁর 'শিশু' কাব্য থেকে নেওয়া।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

মাঝি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে–
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে;
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁতরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে
শুধু রাতদুপরে
শেয়ালগুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার ’পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়
চখাচখী যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর;
মানিকজোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের পর।

সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি একমনে–
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

এপার ওপার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলেমেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়
অনেক বেলা হলে–
আসব তখন চলে
'বড়ো খিদে পেয়েছে গো–
খেতে দাও মা' বলে।
আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি।

শব্দের অর্থ

আঁধার: অন্ধকার।

কাদাখোঁচা: পাখির নাম।

কাশ: তৃণজাতীয় গাছ।

খেয়াঘাট: নৌকা পারাপারের ঘাট।

চখাচখী: এক জোড়া চক্রবাক পাখি; চখা ও চখী।

জলা: জলমগ্ন ভূমি।

জাল টেনে নেওয়া: জাল দিয়ে মাছ ধরা।

ঝাঁকে ঝাঁকে: দলে দলে।

ঝাউডাঙা: যে ডাঙায় ঝাউগাছ আছে।

ডিঙি নৌকা: এক ধরনের নৌকা।

তারি ধারে: তারই পাশে।

ধারে ধারে: কাছাকাছি।

পাঁক: কাদা।

পায়ের চিহ্ন: পায়ের দাগ।

পার: তীর।

বাঁশের খোঁটা: বাঁশের ছোটো খুঁটি।

বিদেশ: দূরে কোথাও।

মানিকজোড়: পাখির নাম।

রাতদুপর: রাত দুপুর; গভীর রাত।

শর: নলখাগড়া গাছ।

সারে সারে: সারিবদ্ধভাবে।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। এই কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘মাঝি’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘মাঝি’ কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

মিল-শব্দ খুঁজি

ছড়া-কবিতায় এক লাইনের শেষ শব্দের সাথে পরের লাইনের শেষ শব্দের মিল থাকে। যেমন: পারে–ধারে–সারে, রাজি–মাঝি ইত্যাদি। তোমরাও এভাবে মিল-শব্দ তৈরি করতে পারো। নিচে কিছু শব্দ দেওয়া হলো। এগুলোর এক বা একাধিক মিল-শব্দ লেখো।

শব্দ	মিল-শব্দ
১. ছেলে	
২. মেয়ে	
৩. ঘর	
৪. যত	
৫. তখন	
৬. পার	
৭. আঁধার	
৮. জাল	
৯. বাঁশ	
১০. জলা	
১১. দিন	
১২. আসে	

এভাবে যে কোনো শব্দের মিল-শব্দ তৈরি করা যায়। তোমরা এবার জোড়ায় জোড়ায় মিল-শব্দের খেলা খেলতে পারো। একজন উপরের বারোটি শব্দের বাইরে যে কোনো একটি শব্দ বলবে; অন্যজন সেটির মিল-শব্দ বানাবে।

কবিতা পড়ি ২

বন্দে আলী মিয়া ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ময়নামতীর চর', 'কুঁচবরণ কন্যা', 'শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা' ইত্যাদি। কবিতায় পল্লি-প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। নিচের কবিতাটি তাঁর 'ময়নামতীর চর' নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

ময়নামতীর চর

বন্দে আলী মিয়া

এ-পারের এই বুনো ঝাউ আর ও-পারের বুড়ো বট
মাঝখানে তার আগাছায় ভরা শুকনো গাঙের তট;
এরি উঁচু পারে নিত্য বিহানে লাঙল দিয়েছে চাষি,
কুমিরেরা সেথা পোহাইছে রোদ শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি।
কূলে কূলে চলে খরশুলা মাছ, দাঁড়িকানা পালে পালে
ছোঁ দিয়ে তার একটারে ধরি গাঙচিল বসে ডালে
ঠোঁট চেপে ধরি আছাড়ি আছাড়ি নিস্তেজ করি তায়
মুড়ো পেটি লেজ ছিঁড়ি একে একে গিলিয়া গিলিয়া খায়।

এরি কিছু দূরে একপাল গোরু বিচরিছে হেথা সেথা
শিঙে মাটি মাখা দড়ি ছিঁড়ি ষাঁড় চলে সে স্বাধীনচেতা।
মাথা নিচু করি কেহ বা ঝিমায় কেহ বা খেতেছে ঘাস,
শুয়ে শুয়ে কেহ জাবর কটিয়া ছাড়িতেছে নিশ্বাস;
গোচর পাখিরা ইহাদের গায়ে নির্ভয়ে চলে ফেরে
উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে;
বক পাখিগুলো গোচর পাখির হয়েছে অংশীদার
শালিক কেবলই করিছে ঝগড়া কাজ কিছু নাই তার।

নতুন চরের পলি জমিটাতে কলাই বুনেছে যারা
আখের খামারে দিতেছে তারাই রাতভর পাহারা;
খেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে পুঁতে শূন্যে বেঁধেছে ঘর
বিচালি বিছায়ে রচেছে শয্যা বাঁশের বাঁখারি পর।
এমন শীতেও মাঝ মাঠে তারা খড়ের মশাল জ্বালি
ঠকঠকি নেড়ে করিছে শব্দ হাতে বাজাইছে তালি।
ওপার হইতে পদ্মা সাঁতারি বন্য বরাহ পাল
এ-পারে আসিয়া আখ খায় রোজ ভেঙে করে পয়মাল।

শব্দের অর্থ

আছাড়ি আছাড়ি: বারে বারে আছাড় দেওয়া।

আঠালু: গবাদি পশুর গায়ে এঁটে থাকা পরজীবী কীট।

কলাই: মটর ডাল।

খড়ের মশাল: অনেকক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা খড়ের পুটুলি।

খরশুলা মাছ: জলের উপর চোখ ভাসিয়ে চলে এমন মাছ।

গাঙের তট: নদীর তীর।

গোচর পাখি: গোরু যেখানে চরে, সেখানে ঘুরে বেড়ানো পাখি।

জাবর কাটা: চিবিয়ে গিলে খাওয়া খাবার পুনরায় মুখের মধ্যে এনে চিবানো।

ঠকঠকি: চকমকি পাথর।

দাঁড়িকানা: ডানকানা মাছ।

নিত্য বিহানে: রোজ সকালে।

পয়মাল: ধ্বংস।

পেটি: মাছের পেট দিককার অংশ।

বরাহ: শূকর।

বাঁখারি: বাঁশের চাটাই।

বিচরিছে: বিচরণ করছে।

বিচালি: খড়।

মুড়ো: মাছের মাথা।

রোদ পোহানো: গায়ে রোদ লাগানো।

হেথা সেথা: এখানে সেখানে।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘ময়নামতীর চর’ কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘ময়নামতীর চর’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'ময়নামতীর চর' কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

কবিতায় শব্দের পরিবর্তন

কবিতায় অনেক সময়ে শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়। ছন্দ মেলাতে গিয়ে কবিরা সাধারণত এটি করে থাকেন। 'ময়নামতীর চর' কবিতা থেকে এমন কিছু শব্দের তালিকা দেওয়া হলো:

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
বিহানে	সকালে
ধরি	ধরে
আছাড়ি	আছাড় মেরে
তায়	সেটাকে
ছিঁড়ি	ছিঁড়ে
বিচরিছে	বিচরণ করছে
হেথা সেথা	এখানে সেখানে
কেহ	কেউ
খেতেছে	খাচ্ছে
ঠোকরিয়া	ঠোকর মেরে
রচেছে	রচনা করেছে
পর	উপর

কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর

কবিতায় যে বর্ণনা থাকে, তাকে গদ্যে রূপান্তর করা যায়। 'ময়নামতীর চর' কবিতা থেকে এ রকম একটি বিবরণ তৈরি করা হলো:

> নদীর এক পারে বুনো ঝাউগাছ রয়েছে। অন্য পারে রয়েছে বুড়ো একটা বটগাছ। তার মাঝখানে রয়েছে আগাছায় ভরা নদীর চর। চরের উঁচু দিকে প্রতিদিন সকালে চাষি লাঙল চালায়। চরের এক পাশে কুমির রোদ পোহায়। নদীর কূল ঘেঁষে খরশুলা ও দাঁড়িকানা মাছ দল বেঁধে চলে। গাঙচিল ছোঁ দিয়ে মাছ ধরে ডালে এসে বসে। তারপর ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে মাছটিকে আছাড় মেরে নিস্তেজ করে এবং মাছটির মাথা-পেট-লেজ একে একে ছিঁড়ে গিলে খায়।
>
> কিছু দূরে একপাল গরু চরে বেড়ায়। একটা ষাঁড় দড়ি ছিঁড়ে এদিক ওদিক ছুটে চলে, যার শিঙে মাটি মাখা। কোনো কোনো গোরু মাথা নিচু করে করে ঝিমায়, কেউ ঘাস খায়, কেউ শুয়ে শুয়ে জাবর কাটে। কিছু পাখি গোরুর গায়ে লেগে থাকা উকুন ও আঠালু ঠুকরে ঠুকরে খায়। বক পাখিরাও এদের সঙ্গী হয়। আর শালিক পাখি শুধু কিচির মিচির করে।
>
> নতুন চরের পলি মাটিতে কৃষকেরা কলাই বুনেছে। তারা এখন সারা রাত ধরে আখের খেতে পাহারা দেয়। কৃষকেরা খেতের কোনায় বাঁশ পুতে তার উপরে ঘর বেঁধেছে। বাঁশের চাটাইয়ের উপর বিচালি বিছিয়ে পাতা হয়েছে বিছানা। শীতের মধ্যেও তারা মাঠের মাঝখানে খড়ের আগুন জ্বালায়, ঠকঠকি নেড়ে শব্দ করে আর হাতে তালি বাজায়। পদ্মা নদীর ওপার থেকে বুনো শূকর নদীর এপারে এসে রোজ আখ খায়, আখের খেত নষ্ট করে।

কবিতা পড়ি ৩

আল মাহমুদ বাংলাদেশের প্রধান কবিদের একজন। তিনি ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের মধ্যে আছে 'লোক লোকান্তর', 'কালের কলস', 'সোনালি কাবিন' ইত্যাদি। নিচের 'নোলক' কবিতাটি কবির 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' নামের কবিতার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে আবৃত্তি করো।

নোলক

আল মাহমুদ

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে?
–হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বলল কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।

জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাব তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো!
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো-
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক।
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাব না।

শব্দের অর্থ

আহার ভরা বুক: শস্যে পরিপূর্ণ স্থান।
এলিয়ে খোঁপা: খোঁপা খুলে।
ঘরকে: ঘরে।
জল ছাড়িয়ে: নদী অতিক্রম করে।
নোলক: নাকে পরার অলংকার।
পাখ ছড়িয়ে: পাখা মেলে।
পাখপাখালি: নানা জাতের পাখি।
পিন্দেছি: পরেছি।
বকরা: বকগুলো।
মিনতি: কাতর প্রার্থনা।
হরিণবেড়ের বাঁক: নদীর কোনো বাঁকের নাম।
হরিৎ টিয়ে: সবুজ রঙের টিয়ে।

কবিতা বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘নোলক’ কবিতায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘নোলক’ কবিতাটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

‘নোলক’ কবিতাটির সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

তালে তালে পড়ি

‘নোলক’ কবিতাটি সবাই মিলে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়ো। যেখানে যেখানে তালি পড়ছে, সেখানে সেখানে বাঁকা দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। পড়ার সময়ে বিষয়টি খেয়াল করো।

/আমার মায়ের /সোনার নোলক /হারিয়ে গেল /শেষে

/হেথায় খুঁজি /হোথায় খুঁজি /সারা বাংলা/দেশে।

/নদীর কাছে /গিয়েছিলাম, /আছে তোমার /কাছে?

/–হাত দিও না /আমার শরীর /ভরা বোয়াল /মাছে।

/বলল কেঁদে /তিতাস নদী /হরিণবেড়ের /বাঁকে

/শাদা পালক /বকরা যেথায় /পাখ ছড়িয়ে /থাকে।

/জল ছাড়িয়ে /দল হারিয়ে /গেলাম বনের /দিক

/সবুজ বনের /হরিৎ টিয়ে /করে রে ঝিক/মিক

/বনের কাছে /এই মিনতি, /ফিরিয়ে দেবে /ভাই,

/আমার মায়ের /গয়না নিয়ে /ঘরকে যেতে /চাই।

/কোথায় পাব /তোমার মায়ের /হারিয়ে যাওয়া /ধন

/আমরা তো সব /পাখপাখালি /বনের সাধা/রণ।

/সবুজ চুলে /ফুল পিন্দেছি /নোলক পরি /না তো!

/ফুলের গন্ধ /চাও যদি নাও, /হাত পাতো হাত /পাতো–

/বলে পাহাড় /দেখায় তাহার /আহার ভরা /বুক।

/হাজার হরিণ /পাতার ফাঁকে /বাঁকিয়ে রাখে /মুখ।

/এলিয়ে খোঁপা /রাত্রি এলেন, /ফের বাড়ালাম /পা

/আমার মায়ের /গয়না ছাড়া /ঘরকে যাব /না।

কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

কবিতার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

কবিতা কী

কবিতার বাক্যগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। কবিতার ভাষাকে সুন্দর করার জন্য ছন্দ ও মিলের ব্যবহার করা হয়। ছন্দ হলো নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে থেমে থেমে বলা। আর মিল হলো একই রকম উচ্চারণের শব্দ। গদ্য রচনায় যেমন অনুচ্ছেদ থাকে, তেমনি কবিতায়ও ছোটো ছোটো অংশ থাকে, যাকে বলে স্তবক। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের বলে কবি। অনেকগুলো কবিতা নিয়ে যে বই হয়, তার নাম কাব্য। কবিতার ভাষাকে পদ্য-ভাষা বলা হয়।

কবিতায় সাধারণত পর পর দুই লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে। এর বাইরেও কবিরা নানা ভাবে মিল তৈরি করেন। যেমন, 'মাঝি' কবিতার একই রকম মিল একাধিক লাইনের শেষে আছে। যেমন: পারে–ধারে–সারে, ফেলে–জেলে–ছেলে ইত্যাদি।

কবিতায় শব্দ-রূপের পরিবর্তন হয়। 'ময়নামতীর চর' কবিতায় কিছু শব্দের রূপের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। অন্য কবিতায়ও এ রকম পরবর্তিত শব্দ দেখা যাবে। তাছাড়া পদ্যের ভাষা গদ্যের ভাষার মতো হয় না। যে কোনো কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর করলে বিষয়টি বোঝা যায়।

তাল রেখে পড়ার ব্যাপারটি কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তালের ভিত্তিতে নানা রকম ছন্দ তৈরি হয়। 'নোলক' কবিতার মতো অন্যান্য কবিতাও তালে তালে পড়া যায়।

কবিতা লিখি

কবিতা লেখা যায় যে কোনো বিষয় নিয়ে। এই বিষয় হতে পারে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু, কোনো ঘটনা বা কাহিনি। কবিতার মধ্যে মনের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ পায়। নিচের ফাঁকা জায়গায় তুমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে একটি কবিতা লেখো। লেখার সময়ে কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রেখো। কবিতার একটি নাম দাও।

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

যাচাই করি

তোমার লেখা কবিতায় নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কি না, যাচাই করে দেখো।

১. লাইনের শেষে মিল-শব্দ আছে কি না।

২. তালে তালে পড়া যায় কি না।

৩. লাইনগুলো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কি না।

৪. এর ভাষা গদ্যের ভাষার চেয়ে আলাদা কি না।

৫. শব্দের চেহারায় কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না।

একজনের লেখা কবিতা অন্যকে পড়তে দাও। প্রত্যেকের কবিতা নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করো।

২য় পরিচ্ছেদ

ছড়া

ছড়া পড়ি

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও ছড়া-কবিতা লিখেছেন। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে আছে 'পথে প্রবাসে', 'বাংলাদেশে', 'উড়কি ধানের মুড়কি' ইত্যাদি। নিচে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি ছড়া দেওয়া হলো। এটি তাঁর 'রাঙা মাথায় চিরুনি' ছড়ার বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

ছড়াটি নীরবে পড়ো; পড়ার সময়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সরবে পড়ো।

ঢাকাই ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

বলছি শোনো কী ব্যাপার
ডাকল আমায় পদ্মাপার
আধ ঘণ্টা আকাশ পাড়ি
তারই জন্যে কী ঝকমারি।

অবশেষে পেলেম ছাড়া
বিমানেতে ওঠার তাড়া।
পেয়ে গেলেম যেমন চাই
বাতায়নের ধারেই ঠাঁই।

এই কি সেই পদ্মা নদী
সিন্ধুসম যার অবধি?
আঁকাবাঁকা জলের রেখা
পালতোলা নাও যায় যে দেখা।

একটু বাদে এ কোন শহর
ঢাকা নাকি? বেশ তো বহর!
বিমান যখন থামল এসে
পৌঁছে গেলাম ভিন্ন দেশে।

মোদের গরব মোদের আশা
শ্রবণ জুড়ায় বাংলা ভাষা।
বন্ধুজনের দর্শনে
নয়ন জুড়ায় হর্ষণে।

বাংলা লিপি দিকে দিকে
জয়ের চিহ্ন গেছে লিখে।
কোথায় গেল পাকিস্তান
খান সেনা আর টিক্কা খান।

রাজার বাগ আর রায়ের বাজার
বধ্যভূমি ইটের পাঁজার।
মেলে দেখি মানসনেত্র
কারবালা কি কুরুক্ষেত্র।

একেই ঘিরে হবে লিখা
মহান কত আখ্যায়িকা।
নতুন লেখক সম্প্রদায়
নেবেন এসে লেখার দায়।

শব্দের অর্থ

অবধি: বিস্তার।
আখ্যায়িকা: কাহিনি।
ইটের পাঁজা: ইটের স্তূপ।
কারবালা: ইরাকের একটি জায়গার নাম, যেখানে এজিদ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ইমাম হোসেন (রা) শহিদ হন।
কুরুক্ষেত্র: মহাভারতে উল্লেখিত একটি জায়গার নাম, যেখানে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।
খান সেনা: পাকিস্তানি সৈন্য।
ঝকমারি: ঝামেলা।
টিক্কা খান: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক।
দর্শন: দেখা।
বধ্যভূমি: যেখানে মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।
বহর: আয়তন।
বাতায়ন: জানালা।
মানসনেত্র: মনের চোখ।
রাজার বাগ: ঢাকা শহরের একটি জায়গা, যেখানে পুলিশের ব্যারাক আছে। পঁচিশে মার্চ রাতে এখানে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পুলিশের প্রতিরোধ-যুদ্ধ হয়।
রায়ের বাজার: ঢাকা শহরের একটি জায়গা, মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা যেখানে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলে রাখে।
শ্রবণ: কান।
সম্প্রদায়: গোষ্ঠী।
হর্ষণ: আনন্দ।

ছড়া বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। 'ঢাকাই ছড়া' নামের ছড়ায় কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

‘ঢাকাই ছড়া’ নামের ছড়াটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

খেয়াল করি

‘ঢাকাই ছড়া’ পড়ার সময়ে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল করি।

১. লাইনের শেষে মিল-শব্দ আছে কি না।

২. শব্দ-রূপের পরিবর্তন হয়েছে কি না।

৩. তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায় কি না।

১. মিল-শব্দগুলো নিচে লেখো:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২. পরিবর্তিত শব্দগুলো নিচে লেখো। একইসঙ্গে শব্দগুলোর প্রমিত রূপ পাশে দেখাও। একটি করে দেখানো হলো।

কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ	শব্দের প্রমিত রূপ
আমায়	আমাকে

৩. কোথায় কোথায় তাল পড়ছে দাগ দিয়ে দেখাও। প্রথম চার লাইন করে দেখানো হলো। (তাল বোঝার জন্য ছড়াটি পড়ার সময়ে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়ো। খেয়াল করো, এখানে প্রতি লাইনে দুটি করে অংশ পাওয়া যাচ্ছে।)

/বলছি শোনো /কী ব্যাপার
/ডাকল আমায় /পদ্মাপার
/আধা ঘণ্টা /আকাশ পাড়ি
/তারই জন্যে /কী ঝকমারি।

অবশেষে পেলেম ছাড়া
বিমানেতে ওঠার তাড়া।
পেয়ে গেলেম যেমন চাই
বাতায়নের ধারেই ঠাঁই।

এই কি সেই পদ্মা নদী
সিন্ধুসম যার অবধি?
আঁকাবাঁকা জলের রেখা
পালতোলা নাও যায় যে দেখা।

একটু বাদে এ কোন্ শহর
ঢাকা নাকি? বেশ তো বহর!
বিমান যখন থামল এসে
পৌঁছে গেলাম ভিন্ন দেশে।

মোদের গরব মোদের আশা
শ্রবণ জুড়ায় বাংলা ভাষা।
বন্ধুজনের দর্শনে
নয়ন জুড়ায় হর্ষণে।

বাংলা লিপি দিকে দিকে
জয়ের চিহ্ন গেছে লিখে।
কোথায় গেল পাকিস্তান
খান্ সেনা আর টিক্কা খান্।
রাজার বাগ আর রায়ের বাজার
বধ্যভূমি ইটের পাঁজার।
মেলে দেখি মানসনেত্র
কারবালা কি কুরুক্ষেত্র।

একেই ঘিরে হবে লিখা
মহান কত আখ্যায়িকা।
নতুন লেখক সম্প্রদায়
নেবেন এসে লেখার দায়।

ছড়ার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ছড়ার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

কবিতা ও ছড়ার সম্পর্ক

কবিতার সঙ্গে ছড়ার মিল রয়েছে অনেক জায়গায়। তবে, এই মিলের ভেতরেও কবিতার মধ্যে ছড়াকে আলাদা করে চেনা যায়।

১. কবিতায় মিল-শব্দ থাকে। কোনো কবিতায় লাইনের শেষে মিল-শব্দ নাও থাকতে পারে। তবে ছড়ায় অবশ্যই লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে।
২. কবিতার মতো ছড়াতেও শব্দরূপের পরিবর্তন হয়।
৩. কবিতা তাল দিয়ে দিয়ে পড়া যায়। এই তাল কখনো ধীর গতিতে পড়ে, কখনো দ্রুত গতিতে পড়ে। আবার কোনো কোনো কবিতায় তাল একেবারেই থাকে না। তবে, ছড়া অবশ্যই তাল দিয়ে পড়া যায়। আর সেই তালও পড়ে খুব ঘন ঘন।

ছড়া কী

ছড়া মূলত শিশুদের জন্য বানানো কবিতা। ছড়ার প্রতি জোড়া লাইনের শেষে মিল-শব্দ থাকে এবং দ্রুত তালে পড়া যায়। ছড়ার আয়তন সাধারণত ছোটো হয়। ছড়ার লাইনগুলোও আকারে ছোটো হয়ে থাকে। কবিতার মতো ছড়াও যে কোনো বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে। অনেক সময়ে অকারণ বা অর্থহীন বিষয় নিয়েও আবোল-তাবোল ছড়া লেখা হয়।

যাঁরা ছড়া লেখেন তাঁদের বলে ছড়াকার।

৩য় পরিচ্ছেদ

গান

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি। বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। তাঁর লেখা 'চল্ চল্ চল্' গানটি বাংলাদেশের রণসংগীত। তিনি নানা বিষয় নিয়ে গান লিখেছেন এবং সেসব গানে নতুন নতুন সুর দিয়েছেন। এছাড়া তিনি গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ও নাটক লিখেছেন। 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'মৃত্যুক্ষুধা', 'শিউলিমালা', 'যুগবাণী' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। নিচে কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান দেওয়া হলো।

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম

কাজী নজরুল ইসলাম

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল ॥
মোরা আকাশের মতো বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন,

মোরা জানি না কো রাজা রাজ-আইন,
মোরা পারি না শাসন-উদূখল!
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল-কল্
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা-জল
কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ॥

মোরা দিল-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভ-চর,
মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্,
মোরা মুক্তধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল ॥

শব্দের অর্থ

ঝঞ্ঝা: ঝড়।

উদ্দাম: বাধাহীন।

নির্ভয়: ভয়হীন।

প্রকৃতি: চারপাশের জগৎ।

সচ্ছল: পরিপূর্ণ।

মরু-সঞ্চর বেদুইন: মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো যাযাবর।

রাজ-আইন: রাজার আইন।

উদূখল: মুষল, মুগুর।

শতদল: পদ্ম।

সিন্ধু-জোয়ার: সাগরের জোয়ার।

পাগলা-ঝোরা: উদ্দাম ঝরনা।

ঝরা-জল: ঝরে পড়া জল।

দিল-খোলা: প্রাণখোলা।

প্রান্তর: মাঠ

অটল: টলানো যায় না এমন।

মহীধর: পাহাড়।

মুক্ত-পক্ষ: ডানা-খোলা।

নভ-চর: যা আকাশে চরে বেড়ায়।

উচ্ছল: চঞ্চল।

বনফল: বুনো ফল।

শয্যা: বিছানা।

শ্যামল: ঘন সবুজ।

বন-তল: বনভূমি।

দরিয়া: সাগর।

মুক্তধারা: বাধাহীন স্রোত।

গান গাই

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানটি সবাই মিলে গাও।

গান বুঝি

উপরের গানে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কিছু প্রশ্ন লিখে রাখো।

বুঝে লিখি

কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানটি পড়ে কী বুঝতে পারলে তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

কবিতার সাথে গানের কী কী পার্থক্য আছে, দলে আলোচনা করে বের করো। গানের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

গান কী

সুর করে গাওয়া কথাকে গান বলে। গানের মধ্যে বিশেষ কোনো আবেগ বা অনুভূতি প্রকাশ পায়।

গানের কথা যাঁরা লেখেন, তাঁদের বলা হয় গীতিকার। গীতিকাররা গানের কথাকে কবিতার মতো করে লেখেন। এই কথা অনুযায়ী গানের নানা রকম নাম হয়, যেমন: পল্লিগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত ইত্যাদি।

গানের কথায় নানা রকম সুর থাকে। সুর হলো কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা। সুরের এককের নাম স্বর। এই স্বর মূলত সাতটি: সা রে গা মা পা ধা নি। যাঁরা গানে সুর দেন, তাঁদের বলে সুরকার।

গানে নানা রকম তাল থাকে। গানের সুর ও তাল ঠিক রাখার জন্য অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, যেমন: হারমোনিয়াম, তবলা, একতারা, তানপুরা, গিটার ইত্যাদি। যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজান, তাঁদের বলা হয় বাদক বা যন্ত্রশিল্পী।

গানের কথা, সুর ও তাল মেনে যিনি গান পরিবেশন করেন, তাঁকে বলা হয় গায়ক বা শিল্পী।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

গল্প

গল্প পড়ি ১

শওকত ওসমানের জন্ম ১৯১৭ সালে এবং মৃত্যু ১৯৯৮ সালে। তিনি অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'জাহান্নম হইতে বিদায়' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইয়ের মধ্যে আছে 'ওটন সাহেবের বাংলো', 'মসকুইটো ফোন' ইত্যাদি। নিচে শওকত ওসমানের একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

তোলপাড়

শওকত ওসমান

একদিন বিকেলে হন্তদন্ত সাবু উঠান থেকে 'মা মা' চিৎকার দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। জৈতুন বিবি হকচকিয়ে যায়। রান্নাঘরে পাক করছিল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শুধায়, কী রে–এত চিক্কর পাড়স ক্যান?

–মা, ঢাকা শহরে গুলি কইরা মানুষ মারছে–

–কে মারছে?

–পাঞ্জাবি মিলিটারি।

দেখা যায় সাবু খুব উত্তেজিত। মুখ দিয়ে কথা তাড়াতাড়ি বের করে দিতে চাইলেও পারে না। কারণ, শরীর থরথর কাঁপছে। হাতে মুঠি বারবার শক্ত হয়।

–মা, একজন দুজন না। হাজার হাজার মানুষ মারছে।

–কস কী, হাজার হাজার?

–হ, সব মানুষ শহর ছাইড়া চইলা আইতাছে।

ঢাকা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী গাবতলি গ্রাম। কিন্তু যাতায়াতের সুবিধা নেই। তাই সব খবরই দুদিন বাদে এসে পৌঁছায়। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। পরদিনেই পাওয়া গেছে সব খবর। যারা জওয়ান তারা সোজা হেঁটে হেঁটে বাড়ি পৌঁছেছে। তাই খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাঞ্জাবি মিলিটারি ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে।

পরদিন সাবুর সামনে গোটা শহর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে জেলা বোর্ডের সড়ক। সেই পথে মানুষ আসতে লাগল। একজন দুজন নয়, হাজার হাজার। একদম পিলপিল পিঁপড়ের সারি। গাবতলি গ্রাম তাদের গন্তব্য নয়। আরও দূরে যাবে তারা। কেউ কুমিল্লা, কেউ নোয়াখালি, কেউ ময়মনসিংহ–একদম গারো পাহাড়ের কাছাকাছি, আরও নানা এলাকায়।

দারুণ রোদ্দুর মাথার উপরে। আর ভিড়। নিশ্বাসে নিশ্বাসে তাপ বাড়ে। হাঁটার জন্য ক্লান্তি বাড়ে। সব মিলিয়ে জওয়ান মানুষেরাই খাবি খাচ্ছে। মেয়ে, শিশু এবং বেশি বয়সীদের তো কথাই নেই। ক্ষুধার কথা চুলোয় যাক, পিয়াসে ছাতি ফেটে দুতিন জন রাস্তার ধারেই শেষ হয়ে গেল।

জৈতুন বিবি মুড়ি ভেজে দিয়েছিল খুব ভোর-ভোর উঠে। সাবু চাঙারি বোঝাই করে মুড়ি এনে ওদের খাইয়েছে। নিজেরা কীভাবে চলবে সে কথা ভাবেনি। মুড়ি শেষ হলে সে পানি জোগানোর কাজে এগিয়ে গেছে।

এক প্রৌঢ় নারীকে দেখে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ দেখে বোঝা যায় অনেক হেঁটেছেন, অথচ তার জীবনে হাঁটার অভ্যেস নেই। সাবুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

–মা, পানি খাবেন?

-দাও, বাবা। প্রৌঢ় নারী মুখ খুললেন। গ্লাস আবার ধুয়ে জালা থেকে পানি এগিয়ে দিয়েছিল সাবু। খালি গা। পরনে হাফপ্যান্ট, তাও ময়লা। বড়ো লজ্জা লাগে সাবুর। প্রৌঢ়া পানি খেয়ে তৃপ্ত। হাতে চামড়ার উপর নকশা-আঁকা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট সাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা, তুমি কিছু কিনে খেও।

-এ কী! না-না-

-নাও, বাবা।

-মাফ করবেন। টাকা নিলে আমারে মা বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিব। আমারে কইয়া দিছে, শহেরের কত গণ্যমান্য মানুষ যাইব রাস্তা দিয়া! পয়সা দিলে নিবি না। খবরদার।

সেই পৌঢ়া নারী একটু হাঁফ ছেড়ে বললেন, তোমার মা কিছু বলবেন না।

–আমার মারে আপনি চেনেন না। মা কন, বিপদে পইড়া মানুষ বাড়ি আইলে কিছু লওয়া উচিত না। গরিব হইতাম পারি, কিন্তু আমরা জানোয়ার না।

শেষ কথাগুলোর পর নিরুপায় সেই নারী সাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, যদি কখনো ঢাকা শহরে যাও, আমাদের বাড়িতে এসো।

–আপনাদের বাড়ি?

–লালমাটিয়া ব্লক ডি। আমি মিসেস রহমান।

মিসেস রহমান আবার রাস্তা ধরলেন। সাবু বুঝতে পারে, এই গরমে হাঁটার পক্ষে মোটা শরীর আদৌ আরামের নয়। বেচারা নিরুপায়। শরীর তো আর নিজে তৈরি করেননি।

তিনি নিমেষে ভিড়ে মিশে গেলেন। ভিড় নয় স্রোত। শহর থেকে যে শুধু গণ্যমান্য মানুষ আসছে, তা নয়। সাধারণ মজুর-মিস্ত্রিরা পর্যন্ত আসছে। সাবু ভাবে, তা হলে শহরেও গরিব আছে, যারা তাদের মতোই কোনো রকমে দিন কাটায়, তাদেরই মতো যাদের ঠিকমতো বিশ্রাম জোটে না, আহার জোটে না, কাপড় জোটে না। এই সময় সাবুর আরো মনে হয়, একবার শহর দেখে এলে হতো। লোক তো শহর পর্যন্ত আছেই। এই জনস্রোত ধরে উজানে ঠেলে গেলেই সেখানে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু তার সাহস হয় না।

একদিন তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গেল আট-নয় জনের একটি পরিবার। সম্ভ্রান্ত জন তারা। সত্তর বছরের বুড়ো তাদের সঙ্গে। তিনটি মাঝ-বয়সী মেয়ে–ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স–তাকে ধরে ধরে আনছে। সঙ্গে আরো পাঁচ-ছয়টি কুঁচো ছেলেমেয়ে, কেউ আট বছরের বেশি নয়। আর আছে লুঙ্গি পরা হাফ শার্ট পরিহিত জওয়ান একজন। তার চেহারা জানান দেয় বাড়ির কাজের লোক। বুড়ো ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। কখনো মেয়ে তিনটির সাহায্য নেয়, কখনো জওয়ান কাজের লোকের! পাঁচ-ছটি কুঁচো ছেলেমেয়ের খবরদারিও সহজ নয়। কাজেই এই কাফেলা রীতিমতো নাজেহাল। আকাশে তেমনি কাঠফাটা রোদ।

শোনা গেল, বুড়োর তিন ছেলেকেই তার সামনে পাঞ্জাবি মিলিটারিরা গুলি করে মেরেছে। সঙ্গী মেয়ে তিনটি বিধবা বউ। কুঁচো ছেলেমেয়েগুলো বুড়োর নাতি-নাতনি।

গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে তারা বসেছিল। খবর জানার কৌতূহলে গাবতলি গাঁয়ের অনেকে ছুটে আসে। আজ কিন্তু কাছে এসে সবাই মিলে যায়। সদ্য বিধবা তিনজন। আর সঙ্গে অমন জয়িফ মানুষ। কেউ মিলিটারির জুলুমের খবর জানবার জন্য আগ্রহ দেখায় না। বরং কীভাবে এদের সাহায্য করতে পারে, তাই জিজ্ঞাসা করে।

পিয়াসে সকলেই অস্থির ছিল। কে একজন তাড়াতাড়ি ছোটো কলস আর গ্লাস নিয়ে এল। কিন্তু এই সামান্য আতিথেয়তায় কেউ সন্তুষ্ট নয়। সাবু নিজেও ভেবে পায় না কীভাবে উপকার করবে! আগে ফায়-ফরমাশ খাটতে কী বিরক্ত লাগত। আর এখন কিছু করতে না পারলে অসোয়াস্তি।

বুড়ো ভদ্রলোক রাজি ছিল না। তবু কয়েকজন উপযাচক হয়ে বিভিন্ন ভার নিল। সাবুও বাদ গেল না। সে একটা কচি ছেলেকে কোলে তুলে নিল। দুই মাইল দূরে নদীর ঘাট। সবাই মিলে পালা করে কাঁধে নিয়ে বুড়ো মানুষটিকে নদীর ঘাট পর্যন্ত দিয়ে আসবে। তারপর নৌকায় তুলে দেবে।

সাবুর কোলে গোলগাল বাচ্চাটা। বছর তিন বয়স। বেশ ভারি। কিন্তু ক্লান্তি নেই সাবুর। মাঝে মাঝে অন্য কেউ তার বোঝা হালকা করতে চাইলে সে বলে, আর একটু আগাইয়া দিই।

বৃদ্ধ আশেপাশের বাহকদের বলে, তোমরাই আমার ছেলে, বাবা। এই গরমে তোমরা ছাড়া কে আর এমন সাহায্য করত। ছেলে আর কোথায় পাব–কথা শেষ হয় না, ফোঁপানির শব্দ ওঠে।

আবার বুড়োর ভাঙা ভাঙা গলা শোনা যায়, জীবনে নামাজ কাজা করিনি, বাবা। ইসলামের নাম নিয়ে বলল, পাকিস্তান হলে মুসলমানদের মঙ্গল হবে। হা–এই বয়সে সব ছেলেদের হারিয়ে–বুড়ো কথা শেষ করতে পারে না। দীর্ঘশ্বাস শোনা যায় শুধু।

সমস্ত কাফেলা নীরব। নারীদের মধ্যে একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছিল। তখনেই থেমে গেল। কে আর কথা বলবে এমন জায়গায়। মনে হচ্ছিল, কতগুলো লাশ নিয়ে যেন সবাই হাঁটছে।

সাবু কল্পনার চোখে যেন সামনে দেখতে পায়:

খাকি উর্দি পরা কতগুলো সিপাই তার সামনে। আর সে তাদের লাথি মেরে মেরে ফুটবলের মতো গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অসীম আক্রোশে তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। সেই সব দুশমন কখনও দেখেনি সে। সেই সব জানোয়ার কখনও দেখেনি, যারা তার দেশের মানুষকে বন্যার দিনের পিঁপড়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জুলুমের দাপটে।

অমন জন্তুদের মোকাবিলার জন্য তার কিশোর বুকে আশ্চর্য তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

শব্দের অর্থ

অসোয়াস্তি: খারাপ লাগা।

উপযাচক: যে যেচে কিছু করে।

উর্দি: সৈনিকদের পোশাক।

কাফেলা: পথিকের দল।

কুঁচো: ছোটো।

খাবি খাওয়া: অসুবিধা বোধ করা।

গারো পাহাড়: নেত্রকোণা জেলায় অবস্থিত পাহাড়ের নাম।

চাঙারি: বাঁশ বা বেতের তৈরি ছোটো পাত্র।

চিক্কর: চিৎকার।

জয়িফ: অতি বৃদ্ধ।

জালা: মাটির তৈরি পেট মোটা বড়ো পাত্র।

নাজেহাল: অতিশয় ক্লান্ত।

নিমেষে: চোখের পলকে।

পঁচিশে মার্চ: ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ। এই তারিখ রাতে পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু করে।

পাঞ্জাবি মিলিটারি: মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাধারণ নাম।

প্রৌঢ়: মধ্যবয়সী।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘তোলপাড়’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'তোলপাড়' গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গল্প পড়ি ২

হালিমা খাতুনের জন্ম ১৯৩৩ সালে এবং মৃত্যু ২০১৮ সালে। তিনি ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন; এজন্য তাঁকে ভাষাসৈনিক বলা হয়। হালিমা খাতুন ছোটোদের জন্য অনেক লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'পাখির ছানা', 'পিকনিকে' ইত্যাদি। নিচে তাঁর লেখা একটি গল্প দেওয়া হলো।

গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

আষাঢ়ের এক রাতে

হালিমা খাতুন

একবার দাদার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে আবু বিশাল একটা বোয়াল মাছ ধরেছিল। তখন ছিল আষাঢ় মাস। ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছিল থেকে থেকে। আর বিদ্যুতের ঝলক আকাশের ওপরে সোনার দাগ কেটে পালিয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। যাবার সময় মেঘের আড়াল থেকে তবলার শব্দ শুনিয়ে দিচ্ছিল। আবুর যে বয়স তাতে তার ঘন বর্ষার রাতে মৌরী বিলে মাছ ধরতে যাবার কথা নয়। কারণ বয়স তার মোটে দশ। বড়ো ভাইয়েরা কোনো সময় তাকে সাথে নিতে চায় না। বোয়াল মাছ ধরার দিনও দাদা সাজেদ ও তার বন্ধুরা একেবারেই জানতে পারেনি যে ছোট্ট আবু তাদের সাথে যাচ্ছে। বলে কয়ে যেতে চাইলে দাদারা ওকে সাথে নেবে না। তাই বেচারা আবু চুপি চুপি গিয়ে নৌকার খোলের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে শুয়েছিল এবং সেখানে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বর্ষাকালে মানে আষাঢ় এলেই মৌরী বিলে প্রচুর মাছ পড়ে। বোয়াল, পাঙ্গাস থেকে শুরু করে ট্যাংরা, পুঁটি, পারশে, বেলে সবই পাওয়া যেত। আবুর বড়ো ভাই সাজেদের মাছ ধরার নেশা খুব। অনেকবার সে বড়ো বড়ো মাছ ধরেছে। এবারও দুই বন্ধু বিপুল আর বায়েজিদকে নিয়ে সে মাছ ধরার প্ল্যান করেছিল। তারপর সব গোছগাছ করে বাড়ির নৌকাটা নিয়ে মৌরী বিলের পথে রওনা হলো। সাথে নিল কয়েক রকম জাল, হেরিকেন, মাছ আনার বড়ো বড়ো খালুই। আর নিল রাতের খাবার। নৌকা বাইবে কিষান তিনু। দরকার হলে এরাও হাত লাগাবে। অতিরিক্ত দুটো বৈঠাও সাথে করে নিল তারা।

ওদিকে আবু ছটফট করছে কী করে সে ওদের সাথে যাবে। বিপুল ও বায়েজিদকে নিয়ে সাজেদ যখন নৌকায় মৌরী বিলে যাবার পাকাপাকি প্লান করছিল, তখন আবু তো শুনে মনে মনে ঠিক করে ফেলল যে সে ওদের সাথে যাবেই যাবে। তাতে যা হয় হবে। আবুর এই গোপন প্লান সাজেদরা কিছুই জানতে পারেনি। আকাশে মেঘ, তাই তারা সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়ল। মাছ ধরা হবে রাতে। হেরিকেনের আলো দেখলে মাছেরা কেমন যেন রাতকানা হয়ে যায়। তখন মাছ-শিকারিরা জাল দিয়ে ধরে ফেলে সেই পথভোলা মাছগুলোকে।

কিছুদূর যাবার পর ঝর ঝর করে বৃষ্টি নামল। ওরা তিন জন ছাতা মাথায় দিলো। মাথাল মাথায় তিনু নৌকার হাল ধরে বসে রইল। সন্ধ্যা হলো। বৃষ্টি থামল। হেরিকেন জ্বালাল ওরা। একটু পরেই হেরিকেন নিবু নিবু হয়ে এল। সাজেদ হেরিকেনটা নাড়িয়ে দেখে তেল নেই একটুও তাতে। নৌকার খোলের মধ্যে কেরোসিন তেলের বোতল। পাটাতনের তক্তা তুলে দেখে সেখানে ছোটো মতো কে যেন শুয়ে আছে। সাজেদ চেঁচিয়ে উঠল–

: এই বিপুল। এই বায়েজিদ। দ্যাখ এখানে কে যেন শুয়ে আছে।

: কে আবার নৌকার খোলের মধ্যে শুতে যাবে। বোধ হয় ধানের বস্তা। কিষানেরা নামাতে ভুলে গেছে।

: না, বস্তা না। এই কে তুই? কে? কে? বলে সাজেদ শোয়া ব্যক্তিকে ঠেলা দিলো।

আবু তখন হুড়মুড় করে উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে বলল, আমি আবু। বলেই সে কেঁদে দিয়েছে। সাজেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আবু তুই এখানে কী করে এলি? শয়তান, আজ তোকে পিটিয়ে ঠান্ডা করব। কাউকে না বলে চলে এসেছিস। বাড়িতে সবাই তো কান্নাকাটি শুরু করেছে। তাহালে তো মাছ ধরা যাবে না। বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

আবু তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দাদা মেরো না আমাকে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি মাছ ধরার জন্য। তবে কালুকে বলে এসেছি কেউ খুঁজলে বলে দিতে।'

: ভালো কথা। বুদ্ধির কাজ করেছিস। তা পুচকে ছেলে তুই কী মাছ ধরবি?

: বড়ো মাছ ধরব দাদা।

: বেশ থাক। বড়ো মাছ তোকেই ধরে না নিয়ে যায় দেখিস। দাদার আশ্বাস পেয়ে আবু মনের সুখে গান ধরল: চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।

সাজেদ শুনে বলল, 'মাদল তোর মাথায় না পড়ে! তুই বরং পাটাতনের নিচে তোর জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাক। মাছ এসে তোকে ডেকে তুলবে।'

: না আমি ঘুমাব না। বড়ো মাছ ধরব। তোমরা মাছ ধরবে আর আমি ঘুমিয়ে থাকব, তা হবে না! তা হবে না!

: তা তুই মাছ কী দিয়ে ধরবি?

: আমি বড়শি আর টোপ নিয়ে এসেছি।

আবু তখন তার পুটুলি থেকে বড়শি আর টোপ বের করে দেখাল। তা দেখে সাজেদ ও তার বন্ধুরা হেসেই গড়াগড়ি। এমন অদ্ভুত বড়শি আর টোপ তারা কখনও দেখেনি। সাজেদ বলল–

: ও, এই তোর বড়শি কেরোসিনের টিনের আংটা দিয়ে বানানো! এ দিয়ে মাছ কেন কুমিরও ধরতে পারবি। জলহস্তী তো আমাদের দেশে নেই। থাকলে তাও তোর এই বড়শি দিয়ে ধরতে পারতিস। তা দেখি তোর টোপ। ও, তেলাপোকা। তেলাপোকা কি মাছে খায়?

: খায় খায়, আমি জানি।

: ঠিক আছে তুই নৌকায় বসে কুমির, জলহস্তী যা খুশি ধর। আমরা পানিতে নেমে জাল ফেলব। দেখিস ঘুমিয়ে পড়িস না যেন। আর তিনু ভাই তুমি ওকে দেখ। আমরা চললাম। দেরি হয়ে গেল অনেক। আর দেরি করলে মাছ পাওয়া যাবে না। তোর জন্য খালি খালি সময় নষ্ট হলো। বলে কয়ে এলে কী হতো?

আবু কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। একা নৌকায় থাকতে পেরে আবুর খুব আনন্দ হলো। সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরার সরঞ্জাম বের করল। তার দুটো বড়শিতে তেলাপোকার টোপ গেঁথে পানিতে ছুঁড়ে দিলো। তারপর বড়শির দড়ি নৌকার গলুইয়ের সাথে জড়িয়ে বেঁধে বসে রইল। অন্ধকার চারদিক। কেবল মাছ শিকারিদের হেরিকেনের আলো বিলের পানিতে নেচে চলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মনে হচ্ছে আকাশটাকে কে যেন সোনার কাঠি দিয়ে ভাগ করছে।

আবুর মনে খালি একটাই ভয়। বড়শিতে মাছ ধরা পড়বে কি না। এত কষ্ট করে লুকিয়ে এসে যদি মাছ না পায় তাহলে তো সবাই খেপাবে। আর মারও খেতে হবে নিশ্চয়ই। বড়শির দড়ির সাথে কয়েকটা জোনাকি পলিথিনের থলের মধ্যে ভরে ফাতনার মতো বেঁধে দিয়েছিল। সেই জোনাকি ফাতনার দিকে সে চেয়ে বসেছিল। সুবোধ কাকার কাছে সে শুনেছিল যে বোয়াল মাছ তেলাপোকা ভালোবাসে। তাই সে তেলাপোকার টোপ দিয়ে বড়শি ফেলার কথা ভেবেছিল। কাকা নাকি একবার তেলাপোকার টোপ দিয়ে পাঁচটা চিতল মাছ ধরেছিল। সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। যা হোক, আবু ভাবতে লাগল মাছের কথা। এমন সময়ে দেখল ফাতনাটা শাঁ করে পানির মধ্যে ডুবে গেল। সে তাড়াতাড়ি গলুইয়ের সাথে বাঁধা বড়শির দড়ি ছাড়াতে লাগল। ছাড়াতে ছাড়াতে দড়ি প্রায় শেষ হয়ে গেল। তারপর সে দড়ি টেনে টেনে আবার গলুইয়ের সাথে জড়াতে লাগল। প্রথমে দড়িতে ভার লাগল না। তার মনটাই দমে গেল। কিন্তু একটু পরেই দড়িতে ভার বোধ হতে লাগল আর খুব টানাটানি শুরু হয়ে গেল। এমন সময় বৃষ্টি নামল।

তিনু হাল ধরে বসেছিল। আবু তিনুকে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, তিনু ভাই তিনু ভাই। বড়ো মাছ, শিগগির আস। তিনু বলল–

: ধুর পাগল! এই বিলে বড়ো মাছ কোথা থেকে আসবে। খাল, বিল তো এখন মরেই গেছে। আগের দিন হলে কথা ছিল।

: না বড়ো মাছে ধরেছে। তুমি এসো তিনু ভাই। আমার হাত কেটে যাচ্ছে।

তিনু তখন এগিয়ে এসে বড়শির দড়ি ধরল। তারা দুজনে ধরে দড়ি জড়াতে লাগল হালের খুঁটির সাথে। জড়াতে জড়াতে ওরা দুজন একদম ক্লান্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনও ঝরছে। ওরা ভিজে ভিজে একাকার। কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে ওরা বড়শির দড়ি টেনে যেতে লাগল। টানতে টানতে শেষে একটা হ্যাঁচকা টান দিতে বিশাল বড়ো কী যেন একটা নৌকার খোলের মধ্যে দড়াম করে এসে পড়ল। আর এলোপাথাড়ি লাফালাফি করতে লাগল।

তাতে নৌকা প্রায় ডুবে যাবার মতো হলো। তখন জোর বিদ্যুৎ চমকাল। ওরা সেই আলোতেই দেখল বিশাল একটা বোয়াল মাছ, প্রায় আবুর সমান। বোয়াল লাফাতে লাগল। তিনু তখন খোলের তলা থেকে একটা বস্তা এনে বোয়ালের গায়ে চাপা দিলো। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বোয়াল শান্ত হলো। আবুর খুশির নাচ তখন কে দেখে!

এমন সময়ে সাজেদরা ফিরে এল। আজ তাদের জালে পুঁটি ছাড়া কিছুই ধরা পড়েনি। তাই রাগ করে তারা তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। এসেই দেখে আবুর বিশাল বোয়াল। দেখে তাদের বিশ্বাস হতে চায় না। সাজেদ বলল, 'এই আবু, অত বড়ো বোয়াল কোথা থেকে এল?' আবু বলল, 'পানি থেকে। আর আমি ধরেছি!'

শব্দের অর্থ

এলোপাথাড়ি: এদিক ওদিক।

কিষান: কৃষি-মজুর।

খালুই: মাছ রাখার ঝুড়ি।

গলুই: নৌকার দুই মাথার সরু অংশ।

জোনাকি: অন্ধকারে জ্বলে-নেভে এমন এক ধরনের পোকা।

টোপ: মাছ ধরার জন্য বড়শিতে গেঁথে দেওয়া খাবার।

ধস্তাধস্তি: কোস্তাকুস্তি।

নৌকার খোল: নৌকার পাটাতনের নিচের ফাঁকা জায়গা।

পাকাপাকি প্লান: চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

পাটাতন: কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি নৌকার মেঝে।

পুচকে: খুব ছোটো।

ফাতনা: বড়শির সুতায় বাঁধা ভাসমান কাঠি বা শোলা।

বড়শি: বাঁকা ও আলযুক্ত লোহার কাঁটা যাতে মাছের টোপ গাঁথা হয়।

মাথাল: রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য বাঁশ বা পাতা দিয়ে তৈরি টুপি।

মাদল: এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

রাতকানা: রাতে ভালো দেখতে পায় না এমন।

হাল: নৌকার দিক ঠিক রাখার জন্য বিশেষ বৈঠা।

হেরিকেন: হারিকেন; কাচ দিয়ে ঘেরা কেরোসিনের বাতি।

গল্প বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের গল্পে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

গল্পের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

গল্প কী

কাহিনি বলার জন্য লেখক গদ্য ভাষায় যে রচনা তৈরি করেন, তাকে গল্প বলে। গল্প আয়তনে সাধারণত ছোটো হয়ে থাকে। তবে বড়ো আয়তনের গল্পকে বলে উপন্যাস। যিনি গল্প লেখেন তিনি গল্পকার; আর যিনি উপন্যাস লেখেন, তিনি ঔপন্যাসিক। গল্পকার ও ঔপন্যাসিককে কথাসাহিত্যিক বলা হয়।

প্রতিটি গল্পের মধ্যে কাহিনি থাকে। যেমন, ‘তোলপাড়’ গল্পের কাহিনি: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় কিছু লোক প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর থেকে গ্রামে চলে যাচ্ছে এবং গ্রামের মানুষ তাদের সহযোগিতা করছে।

গল্পের কাহিনি গড়ে ওঠে কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যেমন, ‘তোলপাড়’ গল্পের কাহিনিতে আছে–সাবু, মিসেস রহমান, বৃদ্ধ লোক, গ্রামবাসী ইত্যাদি চরিত্র।

গল্পের চরিত্র অনেক সময়ে কথা বলে, সেসব কথাকে সংলাপ বলা হয়। যেমন, ‘তোলপাড়’ গল্পে মিসেস রহমানের মুখের সংলাপ: ‘বাবা, তুমি কিছু কিনে খেও।’

গল্প লিখি

নিচের ফাঁকা জায়গায় বানিয়ে বানিয়ে তুমি একটি গল্প লেখো। গল্পটির একটি নাম দাও।

_____

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

যাচাই করি

তোমার লেখা গল্প থেকে নিচের বিষয়গুলো খুঁজে বের করো এবং লেখো:

১. কাহিনি (মূল কাহিনি) .....

.....

.....

২. চরিত্র (কয়েকটি চরিত্রের নাম) .....

.....

.....

৩. সংলাপ (যদি থাকে, তার দু-একটি নমুনা) .....

.....

.....

.....

.....

৫ম পরিচ্ছেদ

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ পড়ি

শামসুজ্জামান খানের জন্ম ১৯৪০ সালে এবং মৃত্যু ২০২১ সালে। প্রবন্ধ রচনায় ও লোকসাহিত্য গবেষণায় তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে 'ফোকলোর চর্চা', 'বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য', 'গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা' ইত্যাদি। নিচে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ দেওয়া হলো।

প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এরপর সরবে পড়ো।

বাংলা নববর্ষ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতির আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাস নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার বাঙালিকে এ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। বাঙালি তার সংস্কৃতির উপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তখন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালি এ উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ববাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। এভাবেই বাঙালি জাতিসত্তা গঠন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ এবং তার উদ্‌যাপনের আয়োজন যুক্ত হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ববাংলার বাঙালি পিছু হটেনি। সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে ছায়ানট নববর্ষের উৎসব শুরু করে। স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যেসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।

এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মনে করেন মোগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজন্যই একে 'সন' বা 'সাল' বলে উল্লেখ করা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর 'সাল' হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বঙ্গাব্দও বলেন কেউ কেউ।

বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদারবাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখ করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় তা এখন লুপ্ত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। এ অনুষ্ঠান করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারা বছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। হালখাতা উপলক্ষে দোকানিরা ঝালর কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধুনা জ্বালানো হতো। মিষ্টিমুখ করানো হতো গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।

বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। সে মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন আর নেই। আগে গ্রামবাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না, আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, গরু-মোষের গাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহু সময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন হওয়ায় সে সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলনমেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এইসব মেলা। আবার বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।

নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানা স্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে 'জব্বারের বলী খেলা' বলা হয়।

নববর্ষের এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয়। নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে তারা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে 'বৈসাবি' নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জে হতো গোরুর দৌড়, হাডুডু খেলা; ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই; কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি।

আমাদের নববর্ষ উৎসব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে মেয়েরা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয়।

শব্দের অর্থ

আবহমান: চিরকালীন।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা: সব বয়সের নারী-পুরুষ।

ইলাহি সন: সম্রাট আকবরের চালু করা সাল।

ঐতিহ্য: গর্ব করার মতো পুরাতন বিষয়।

কবিগান: প্রতিযোগিতামূলক এক ধরনের লোকগান।

কারুপণ্য: কাঠ, বাঁশ, বেত ও মাটি দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র।

কীর্তন: রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান।

গম্ভীরা: অভিনয়-ভিত্তিক এক ধরনের লোকগান।

চান্দ্র হিজরি সন: চাঁদের হিসাবের সাথে মিল রেখে তৈরি হিজরি সন।

ছায়ানট: ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন।

জাতিসত্তা: জাতির নিজস্ব পরিচয়।

জৌলুস: জাঁকজমক।

ঝালর কাটা: নকশা করে কাটা।

ধুমধাম: আড়ম্বর।

ধূপধুনা: সুগন্ধি দ্রব্য।

নাগরদোলা: চক্রাকারে ঘোরার দোলনা।

নেকমরদ: জায়গার নাম।

পরিপন্থী: বিরোধী।

পাকিস্তান আমল: ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ।

পুণ্যাহ: নববর্ষে খাজনা আদায়ের প্রতীকী অনুষ্ঠান।

পুতুল নাচ: কাপড় দিয়ে তৈরি করা পুতুল দিয়ে দেখানো নাচ।

পূর্ববাংলা: পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ যে নামে পরিচিত ছিল।

প্রতীকধর্মী: যা কোনো বিষয়কে ইঙ্গিত করে।

প্রবর্তন করা: চালু করা।

ফুঁসে ওঠা: প্রতিবাদী হওয়া।

বর্ণাঢ্য: বিচিত্র রংযুক্ত।

বৈসাবি: বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু নামের তিনটি অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম।

মঙ্গল শোভাযাত্রা: পহেলা বৈশাখে আয়োজিত আনন্দ মিছিল।

মুখর: কোলাহলপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী: পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার সরকার-প্রধানের পদ।

যাত্রা: এক ধরনের লোকনাটক।

যুক্তফ্রন্ট সরকার: ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় গঠিত একটি বহুদলীয় সরকার।

রমনা: ঢাকার একটি জায়গার নাম।

লুপ্ত হওয়া: হারিয়ে যাওয়া।

সমকালীন: একই সময়ের।

সমন্বয় করা: মিল করা।

সর্বজনীন: সবার জন্য।

সাড়ম্বরে: আড়ম্বর সহকারে।

সৌর সন: সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসার কালপর্ব।

সৌহার্দ্যপূর্ণ: আন্তরিক।

স্থবির: গতিহীন।

স্বৈরাচারী: স্বেচ্ছাচারী।

হাডুডু: বাংলাদেশের জাতীয় খেলা।

হালখাতা: নববর্ষে ব্যবসায়ীদের নতুন হিসাবের খাতা খোলার অনুষ্ঠান।

প্রবন্ধ বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। উপরের প্রবন্ধে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি নিজের ভাষায় বলো এবং নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

প্রবন্ধের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

প্রবন্ধ কী

প্রবন্ধ হলো এক ধরনের সুবিন্যস্ত গদ্য রচনা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়; যেমন–ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি। এই বইয়ের ‘পিরামিড’ লেখাটি ইতিহাস বিষয়ক, ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখাটি বিজ্ঞান বিষয়ক, ‘কত কাল ধরে’ লেখাটি সমাজ বিষয়ক এবং ‘বাংলা নববর্ষ’ লেখাটি সংস্কৃতি বিষয়ক।

ধরন অনুযায়ী প্রবন্ধ নানা রকম হতে পারে; যেমন: বিবরণমূলক প্রবন্ধ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি। বিবরণমূলক প্রবন্ধে কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়, তথ্যমূলক প্রবন্ধে মূলত তথ্য তুলে ধরা হয়, আর বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধে উপাত্ত ও তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়।

যিনি প্রবন্ধ লেখেন, তাঁকে বলা হয় প্রাবন্ধিক বা প্রবন্ধকার। প্রবন্ধের মধ্যে সাধারণত আবেগের চেয়ে যুক্তি প্রাধান্য পায়। বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। প্রবন্ধের প্রথম অংশ ভূমিকা নামে পরিচিত। ভূমিকায় মূল আলোচনার ইঙ্গিত থাকে। প্রবন্ধের শেষ অংশ উপসংহার নামে পরিচিত। উপসংহারে প্রাবন্ধিকের সমাপ্তিসূচক মন্তব্য থাকে।

প্রবন্ধ লিখি

প্রবন্ধ লেখার জন্য কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করো। বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে আলোচনা করবে, তা প্রথমে কাগজে টুকে রাখো। এবার আলোচনার দিকগুলো সাজিয়ে নিয়ে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে গদ্যভাষায় বিষয়টি উপস্থাপন করো। লেখার উপরে একটি শিরোনাম দাও।

_____

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

যাচাই করি

প্রবন্ধ লেখা হয়ে গেলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করো:

১. প্রবন্ধটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা? (ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি)

.....

.....

.....

২. প্রবন্ধটির ধরন কী এবং কেন? (বিবরণমূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক) .....

.....

.....

.....

.....

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাটক

মামুনুর রশীদ ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে আছে 'ওরা কদম আলী', 'এখানে নোঙর', 'মানুষ' ইত্যাদি। নিচে মামুনুর রশীদের একটি নাটক দেওয়া হলো।

নাটকটি প্রথমে মনে মনে পড়ো। এরপর শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী একেক জন একেকটি চরিত্রের সংলাপ পাঠ করো।

সেই ছেলেটি

মামুনুর রশীদ

১ম দৃশ্য

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই গান গাইতে গাইতে স্কুলে যাচ্ছে। যেন তাড়া তাদের। একসময় হঠাৎ থেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে ফেলেই চলে যায়। আরজুর পায়ে ব্যথা । সাবু ফিরে আসে।)

সাবু : কী হলো আবার?

আরজু : আমি যে আর হাঁটতে পারছি না!

সাবু : রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না।

আরজু : ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এক্ষুনি যাব।

সাবু : থাক তাহলে।

(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়ালা।)

আইসক্রিমওয়ালা : আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ?

আরজু : কিছু না।

আইসক্রিমওয়ালা : স্কুলে যাবে না?

আরজু : না।

আইসক্রিমওয়ালা : স্কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব স্কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দেখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম ফেরি করতে হতো? যাও স্কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।

আরজু : ভাই শোনো–তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?

আইসক্রিমওয়ালা : আমি তো যাব ঐ বাজারের দিকে।

আরজু : আজ স্কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টিফিন পিরিয়ডের সময়।

আইসক্রিমওয়ালা : ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম।

(আইসক্রিমওয়ালা চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)

আরজু : ভাই শোনো।

হাওয়াই মিঠাইওয়ালা : শুধু শুধু ডাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

আরজু : তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের মতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়াই মিঠাইওয়ালা : হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা–তাই তো মিলিয়ে যায়। যাই–চাই হাওয়াই মিঠাই। (চলে যায়)

আরজু : এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে স্কুলে ফাঁকি দেওয়ার মতলব–স্কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। এখন কী হবে?

২য় দৃশ্য

(টিফিনের ঘণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও অন্য ছেলে-মেয়েরা টিফিন পিরিয়ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন শিক্ষক লতিফ স্যার।)

লতিফ স্যার : এই সাবু, এদিকে শোনো–আচ্ছা আরজুকে দেখছি না যে?

সাবু : স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এ রকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।

লতিফ স্যার : কিন্তু কেন করে?

সাবু : এমনিই।

লতিফ স্যার : এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?

সাবু : জানি না স্যার।

লতিফ স্যার : আচ্ছা। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই স্কুল কামাই করছে?

সোমেন : স্যার, ওর যে কী হয়! হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ার্নিংবেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?

লতিফ স্যার : কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।

মিঠু : স্যার ঐ ছেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।

লতিফ স্যার : কোথায়?

মিঠু : ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।

লতিফ স্যার : নানা কথা? তাহলে স্কুলে এল না কেন?

মিঠু : একসময় বলল তুমি কি স্কুলের দিকে যাবে? আমি বললাম না–এখন বাজারে যাব। তারপর টিফিন পিরিয়ডের দিকে স্কুলে যাব।

লতিফ স্যার : তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আচ্ছা ঐ আমবাগানে কি এখনও আছে?

সোমেন : মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।

লতিফ স্যার : তোমরা চলো তো–

সাবু : স্যার (ওদের চোখে মুখে অনিচ্ছা। হাওয়াই মিঠাইওয়ালা হেঁকে চলেছে–হাওয়াই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওনা দেন।)

৩য় দৃশ্য

(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

আরজু : পাখি, একটু নিচে নামো না! তোমার সাথে কথা কই। আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে গেল না। তুমি নিয়ে যাও না! তোমার ডানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমায় নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব স্কুলে। কী বলছো? ভিজে যাব? ভিজলাম। আবার শুকিয়ে যাব–তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোটো পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না–চন্দনা আমায় নিল না, মেঘ আমায় নিল না–শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কাঁদতে থাকে। হঠাৎ উপস্থিত হয় লতিফ স্যার।)

লতিফ স্যার : আরজু, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি স্কুলে যাওনি কেন?

সোমেন : কাঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কাঁদছেই)

লতিফ স্যার : কোনো ভয় নেই, বলো।

আরজু : স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।

লতিফ স্যার : তোমার বাবা-মাকে বলোনি কেন?

আরজু : বলেছি–বাবা বলেন হাঁটাহাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

লতিফ স্যার : তোমার পা দুটো দেখি–এ তো রোগ, তোমার পা চিকন হয়ে গেছে।

আরজু : মা জানে, সেই ছোটোবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা চিকন–মা বোঝে কিন্তু কাঁদে শুধু।

লতিফ স্যার : তোমরা খেয়াল করনি?

সোমেন : না স্যার।

লতিফ স্যার : তোমাদের বন্ধু না?

সোমেন : জ্বী স্যার।

লতিফ স্যার : তোমার যদি এ রকম হতো?

সোমেন : আমরা বুঝতে পারিনি স্যার। এ রকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে ওকে তুলে ফেলে।)

লতিফ স্যার : বলো স্কুলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?

আরজু : স্কুলে স্যার। (ওদের কাঁধে হাত তুলে আরজু স্কুলে যায়।)

লতিফ স্যার : চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

শব্দের অর্থ

অনুসরণ করা: লক্ষ রাখা।

অবশ হয়ে আসা: চলার শক্তি হারিয়ে ফেলা।

এক্ষুনি: এখনই।

ওয়ার্নিং বেল: সতর্ক করার জন্য বাজানো ঘণ্টা।

চন্দনা: পাখির নাম।

ফেরি করা: পথে পথে ঘুরে জিনিস বিক্রি করা।

মতলব: ফন্দি।

শালিক: পাখির নাম।

স্কুল কামাই করা: স্কুল ফাঁকি দেওয়া।

হাওয়াই মিঠাই: চিনি দিয়ে তৈরি এক রকম খাবার।

নাটকের চরিত্র

এই নাটকে যেসব চরিত্র আছে, তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নাটক বুঝি

শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা দলে ভাগ হও। ‘সেই ছেলেটি’ নাটকে কী বলা হয়েছে, তা দলে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করো। কোন দল কেমন বুঝতে পেরেছে, তা যাচাই করার জন্য এক দল অপর দলকে প্রশ্ন করবে। এজন্য আগেই দলে আলোচনা করে কাগজে প্রশ্নগুলো লিখে রাখো।

বলি ও লিখি

‘সেই ছেলেটি’ নাটকটির কাহিনি প্রথমে গল্পের মতো করে বলো, তারপর লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি

'সেই ছেলেটি' নাটকের সাথে তোমার জীবনের বা চারপাশের কোনো মিল খুঁজে পাও কি না, কিংবা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি না, তা নিচে লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

'সেই ছেলেটি' একটি নাটক। নাটকের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো।

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		

নাটক কী

সংলাপ-নির্ভর রচনাকে নাটক বলে। নাটক মূলত অভিনয়ের জন্য লেখা হয়।

নাটকে একটি কাহিনি থাকে। কাহিনি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

নাটকে এক বা একের বেশি দৃশ্য থাকে। নাটকের এক-একটি অংশকে দৃশ্য বলে। 'সেই ছেলেটি' নাটকে তিনটি দৃশ্য আছে। দৃশ্যগুলোর ঘটনা তিনটি জায়গায় ঘটেছে–১ম দৃশ্য: গ্রামের পাশের রাস্তা, ২য় দৃশ্য: সাবু, আরজুদের স্কুল, ৩য় দৃশ্য: আম বাগান।

নাটকে সাধারণত কয়েকটি চরিত্র থাকে। 'সেই ছেলেটি' নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে আছে–আরজু, সাবু, আইসক্রিমওয়ালা ইত্যাদি।

নাটকের চরিত্ররা যেসব কথা বলে, সেগুলোকে সংলাপ বলা হয়। 'সেই ছেলেটি' নাটকের সংলাপ: সাবু বলছে–'কী হলো আবার?' আরজু বলছে–'আমি যে আর হাঁটতে পারছি না!'

যিনি নাটক লেখেন, তাঁকে বলা হয় নাট্যকার। যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের বলা হয় অভিনেতা। নাটকের অভিনয় যিনি পরিচলনা করেন, তাঁকে বলা হয় পরিচালক বা নির্দেশক। সাধরণত মঞ্চে নাটক অভিনীত হয়। মঞ্চের সামনে বসে যাঁরা নাটক উপভোগ করেন, তাঁদের বলে দর্শক।

টেলিভিশন ও অন্যান্য দৃশ্য-মাধ্যমে আজকাল নানা ধরনের নাটক অভিনীত হয়। রেডিওতেও নাটক শোনা যায়।

সংলাপ লিখি

যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে দুটি চরিত্রের মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

অভিনয় করি

‘সেই ছেলেটি’ নাটকটি কয়েকজন বন্ধু মিলে অভিনয় করো।

৭ম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের নানা রূপ

কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক–এগুলো সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রতিটি রূপের বৈশিষ্ট্য আলাদা। নিচের ছকে তুলনা করার জন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা আছে। টিকচিহ্ন (√) অথবা ক্রসচিহ্ন (×) দেওয়ার মাধ্যমে ছকটি পূরণ করো।

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	কবিতা	ছড়া	গান	গল্প	প্রবন্ধ	নাটক
১	মিলশব্দ						
২	তাল						
৩	নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইন						
৪	সুর						
৫	পদ্য-ভাষা						
৬	গদ্য-ভাষা						
৭	কাহিনি						
৮	চরিত্র						
৯	বিষয়						
১০	অনুচ্ছেদ						
১১	সংলাপ						
১২	অভিনয়						

সাহিত্যের রূপ বুঝি

উপরের ছকের ভিত্তিতে এবং তোমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক–এগুলোর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

কবিতা:

.....

.....

.....

.....

.....

ছড়া:

.....

.....

.....

.....

.....

গান:

.....

.....

.....

.....

.....

গল্প:

.....

.....

.....

.....

.....

প্রবন্ধ:

.....

.....

.....

.....

.....

নাটক:

.....

.....

.....

.....

.....

দেয়াল-পত্রিকা বানাই

তোমাদের লেখা কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক নিয়ে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করো। এ কাজের জন্য শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দল থেকে একটি করে দেয়াল-পত্রিকা তৈরি হবে।